বস্তুসার (Abstract)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকরণগুলির মধ্যে উপন্যাস হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় প্রকরণ। উপন্যাস শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'নভেল', যা ইতালিয় শব্দ 'নভেলা' থেকে এসেছে। উপন্যাস হল গদ্য-আখ্যানের আধুনিক সংস্করণ। যেখানে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রে গ্রথিত বাস্তব-নির্ভর কাহিনিকে চরিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে শিল্পসুলভ ভাবে উপস্থাপন করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা'কে (১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ) ধরা হয়। বাঙালিরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার প্রেরণা পায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কালে একাধিক ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। এরপর বাংলা সাহিত্যাকাশে রবির উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সাহিত্য সৃজনের মধ্য গগনে বিরাজমান তখন বাংলা সাহিত্যে আরেক প্রতিভাবান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) আবির্ভাব হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে সেই সময় রচিত প্রায় সমস্ত সাহিত্যকর্মে প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। এই সময় কিছু তরুণ সাহিত্যিক রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মরিয়া প্রচেষ্টা করেন। তাঁদের এই বিদ্রোহের সুর শোনা গিয়েছিল 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ), 'কালি কলম' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ), 'প্রগতি' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি পত্রিকায়। নতুন প্রজন্ম সবসময়ই নতুনত্ব চায়, তারা সব সময় বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন। আর তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নতুন যুগের সূচনা করে। এই সময়কালকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। আর

রবীন্দ্র বিরোধিতা করে উপরোক্ত পত্রিকায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছিলেন তাঁদের আমরা কল্লোল যুগের সাহিত্যিক হিসেবে চিনি। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-বলয় থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবমুখী ও মৃত্তিকাচারি সাহিত্যজগৎ তৈরি করা। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, কাজী নজরুল ইসলাম, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অবনীনাথ রায় প্রমুখ। সমাজ-বাস্তবতার নাম করে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা সাহিত্যে যথেচ্ছ অশ্লীলতা ও যৌনতার আমদানি করেছেন এই অভিযোগে 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের আক্রমণ চালাতে থাকেন; আর তা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য ধারা পোক্ত জমি লাভ করে। এই কল্লোল যুগের লেখকদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ – ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে) মধ্যে আমরা নানা রকম সাহিত্য প্রতিভার উপস্থিতি লক্ষ করি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলযুগের একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বেদে' (১৯২৭) প্রকাশের পর সাহিত্যজগতে আলোড়ন পড়ে যায়। নবীন সাহিত্যিকরা এই উপন্যাসকে অনন্য ও সাহসী পদক্ষেপ বলে জয়-জয়াকার করেন। কিন্তু প্রবীণ সাহিত্যিকরা এই উপন্যাসকে অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের প্রশংসা করেও সাবধানবাণী শোনান। তাঁর 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে নিষিদ্ধ করা হয়। বহু প্রতিভার অধিকারী ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার এই রাস্তা থেকে সরে এসে তাঁর উপন্যাস রচনায় বৈচিত্র্য আনেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে যৌনতা প্রবলভাবে দেখা দিলেও পরে তিনি এসব থেকে অনেকটা সরে আসেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণচর্চার কারণে হয়তো তাঁর মনে আধ্যাত্মিকতা প্রভাব

ফেলেছিল। এরূপ ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি সম্পর্কের কালিক প্রভাব অন্বেষণে রত হতে চেয়েছি।

প্রথম অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সময়কাল, আত্মকথা ও রচনাসম্ভার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজকুমার সেনগুপ্ত ও মাতা হেমলতা দেবী। ১৩ বছর বয়সে তাঁর পিতা লোকান্তরিত হন। এরপর কলকাতায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে চলে আসেন ও সাউথ সুবার্বন স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পড়াশুনায় মেধাবী অচিন্ত্যকুমার ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স পাশ করার পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়েও পড়াশুনা করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে অচিন্ত্যকুমার নীহারকণা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহরমপুরে মুনসেফ হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। বিচারক পদে তিনি দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল যুগের লেখক ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুলচন্দ্র নাগের উদ্যোগে বের হওয়া ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে সাহিত্য রচনা করা। তাই কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাচারি, রোমান্টিক ও অভিজাত জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য ভাবনা থেকে অনেকটা দূরে সরে এসে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী, খনি অঞ্চল, ফুটপাত, পরিত্যক্ত এলাকায় থাকা মানুষজনদের জীবনকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বিয়াল্লিশটি উপন্যাস, আটটি কাব্যগ্রন্থ, আটত্রিশটি গল্পগ্রন্থ চারটি অনুবাদ গ্রন্থ, চোদ্দোটি জীবনীগ্রন্থ সাতটি ছোটদের বই ও অন্যান্য

পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর পাশাপাশি মহাপুরুষের জীবনীমূলক গ্রন্থ, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ প্রভৃতি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রচনা করেছেন । তিনি একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে 'মতিলাল স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার' দেয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার', 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসের প্রাথমিক পরিচয় ও বিষয়গত বিভাজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসগুলি হল— ১) 'বেদে' (১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ), ২) 'বিবাহের চেয়ে বড়' (১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ), ৩) 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), ৪) 'প্রথম প্রেম' (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ), ৫) 'দিগন্ত' (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ), ৬) 'জননী জন্মভূমিশ্চ' (১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ), ৭) 'ইন্দ্রানী' (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), ৮) 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), ৯) 'তুমি আর আমি' (১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), ১০) 'ঊর্ণনাভ' (১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ), ১১) 'ঢেউয়ের পর ঢেউ' (১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ), ১২) 'একটি গ্রাম্য মেয়ের কাহিনী' (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ), ১৩) 'অন্তরঙ্গ'' (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ), ১৪) 'রূপসী রাত্রি' (১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ), ১৫) 'প্রথম কদম ফুল' (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ), ১৬) 'হিয়ে হিয় রাখনু' (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ), ১৭) 'চলে নীল শাড়ি' (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মূলত রোম্যান্টিক উপন্যাস রচনাতেই আগ্রহী ছিলেন। তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাঁর উপন্যাসে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা দিক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসে

যেমন দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা লক্ষ করা যায়, তেমনি পরকীয় সম্পর্কের জটিলতাও লক্ষ করা যায়। আবার তাঁর উপন্যাসে অবিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা দিক ফুটে উঠেছে। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করলেও মাঝে-মাঝে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষেরা তাঁর উপন্যাসে উঁকি মেরেছে। তিনি শহরকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করলেও গ্রাম-গঞ্জের কথা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম-নোয়াখালির কথা উঠে এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। নারী-পুরুষের দাম্পত্য কলহ, প্রেম, জটিলতা তাঁর বহু উপন্যাসের উপজিব্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসগুলি হল— ১) 'প্রাচীর ও প্রান্তর' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), ২) 'জননী জন্মভূমিশ্চ' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), ৩) 'দিগন্ত' (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ), ৪) উদ্বৃত্ত (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), ৫) 'ইন্দ্রানী' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), ৬) 'নবনীতা' (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), ইত্যাদি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'প্রাচীর ও প্রান্তর' উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি শ্রীঅজিতকুমার দত্তকে উৎসর্গ করা হয়। এই উপন্যাসটি অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুরন্দর ও সীতার দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। 'জননী জন্মভূমিশ্চ' উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসটি একটি সাধারণ পারিবারিক কলহের কাহিনি। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র মা রাজলক্ষ্মী, ছেলে রঙ্গলাল ও পুত্রবধূ আভা। রঙ্গলালের নিজে পছন্দ করে আভাকে বিয়ে করলে

রাজলক্ষ্মী মেনে নিতে পারে না। ধীরে ধীরে তাদের দাম্পত্য প্রেম যতই পূর্ণতা পায় রাজলক্ষ্মীর কাছে তা ততটাই অসহনীয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি পারিবারিক সংহতি নষ্টের কাহিনিতে পরিণত হয়। 'দিগন্ত' উপন্যাসটি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচিকে উৎসর্গ করা হয়। নন্দ ও মনিকার দাম্পত্য সম্পর্ক এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আর্থিক অনটন তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে অসহনীয় করে তোলে। নন্দ নতুন চাকরি নিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যায়। দূরত্ব ও আর্থিক উন্নতি তাদের দাম্পত্য কলহকে অনেকটা প্রশমিত করে। 'ইন্দ্রানী' উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসেও নারী চরিত্রের জয়জয়কার ঘটিয়েছেন লেখক। এখানে মুখ্য চরিত্র ইন্দ্রানী সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে নারীত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। সে সুদর্শনকে বিয়ে করেছে। সুদর্শন বেকার হওয়ায় তাকে নিয়ে চাকরি করতে গেছে। আবার স্বামীকে খোরপোষও পাঠিয়েছে। সেই কালের প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি একটি অভিনব সৃষ্টি।

চতুর্থ অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে পরকীয় সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একাধিক উপন্যাসের কাহিনি পরকীয় সম্পর্ককে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসে পরকীয় সম্পর্কের জটিলতা লক্ষ করা গেছে সেগুলি হল— ১) 'কাকজ্যোৎস্না' (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ), ২) 'তুমি আর আমি' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), ৩) 'পাখনা' (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ), ৪) 'চলে নীল শাড়ি' (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। 'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথমে 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় গল্প আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি তাঁর স্ত্রী নীহারকণা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এই

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিধবা নমিতা। স্বামীর মৃত্যুর পর সে বৈধব্যকে মেনে নিলেও এ পথে বাধা সৃষ্টি করেছে প্রদীপ ও অজয়। তারা তাকে নানা ভাবে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে অবিবাহিত নারী-পুরুষের প্রেমের টানাপোড়েন অন্বেষণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দাম্পত্য প্রেমের জটিলতা ও পরকীয় সম্পর্কের জটিলতার পাশাপাশি অবিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে অশ্রু ও প্রভাতের অবিবাহিত প্রেম সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসে অবিবাহিত নারী-পুরুষের প্রেমের টানাপোড়েন দেখানো হয়েছে সেগুলি হল— ১) 'বেদে' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), ২) 'ছিনিমিনি' (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ), ৩) 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), ৪) 'অন্তরঙ্গ' (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ইত্যাদি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' উপন্যাসটি 'কল্লোল' পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যা থেকে ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে উপন্যাসটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কল্লোলের বন্ধুদের উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়। উপন্যাসটি সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষজনদের নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পচার জীবন বিভিন্ন সময়ে ছয়টি মেয়ে– আহ্লাদি, আসমানি, বাতাসি, মুক্তা বনজ্যোৎস্না ও মৈয়েত্রীকে কেন্দ্র করে অতিবাহিত হয়েছে। 'ছিনিমিনি' উপন্যাসটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে সহায় সম্বলহীন সুধা মাতুলালয়ের আশ্রিতা। তার সঙ্গে বীরেনের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুধা বীরেনের হাত ধরে সবকিছু ফেলে বেরিয়ে গেলেও বীরেন তার পিতার চক্রান্তে সায় দিয়ে সুধাকে ছেড়ে

দিতে পিছুপা হয়নি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'তৃতীয় নয়ন' উপন্যাসটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসে শিল্পী মিহিরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। মিহিরের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। তার প্রণয়িনী মিনতি এই অসময়ে তার পাশে সব সময় থেকেছে, তার সেবা করেছে। কিন্তু মিনতির পিতা তার এই বাড়াবাড়িকে মেনে নিতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি মিনতি ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে। 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগিনী অনুভার প্রেমে পড়েছে বিলেত ফেরত ডাক্তার হিমাদ্রি। অনুভার বান্ধবী বিনীতা তাদের এই সম্পর্ককে মেনে নিতে পারে নি এবং নিজের প্রতি হিমাদ্রিকে আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসের শেষে অনুভার পিতা বনমালীবাবুর অসম্মতি সত্ত্বেও হিমাদ্রি হাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অনুভাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিলতায় কল্লোলের কালের প্রভাব।

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রবীন্দ্র-বিরোধীতা। আর এই রবীন্দ্র বিরোধিতা করতে গিয়ে কল্লোলীয় সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পান। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাচারি, রোমান্টিক ও অভিজাত জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যভাবনা থেকে অনেকটা দূরে সরে আসেন। আর সেটা করতে গিয়ে কল্লোল যুগের লেখকরা সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী, খনি অঞ্চল, ফুটপাত, পরিত্যক্ত এলাকায় থাকা মানুষজনদের জীবনকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। কল্লোলের যুগে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিস্তর প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কল্লোল যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল নর-নারীর যৌবনকে উন্মুক্ত ভাবে

সাহিত্যে প্রকাশ করা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল যুগের লেখক হওয়ায় তাঁর ‘বেদে’, ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’, ‘প্রথম প্রেম’, ‘একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী’ প্রভৃতি উপন্যাসে কল্লোলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর ‘বেদে’ উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বস্তি অঞ্চলকে। এখানে নারী-পুরুষের আদিম প্রবৃত্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর ‘প্রাচীর ও প্রান্তর’ উপন্যাসে পুরন্দরের জৈবিক চাহিদা সামাজিক শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করেছে। উক্ত কারণে উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ‘জননী জন্মভূমিশ্চ’, ‘ইন্দ্রানী’ প্রভৃতি উপন্যাসে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক কখনো কখনো পুরুষের চেয়ে নারীকে ও তার অধিকারকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে এসব ঘটনা অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হলেও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই বিষয়গুলো সহজ ছিল না।

উপসংহার

কল্লোল যুগের ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাস রচনা শুরু করেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি প্রথম দিকে বিদেশি রীতি অনুসরণ করেন। প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে তিনি প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে সাহিত্যে আলোড়ন তৈরি করেন। এই সময়কার প্রায় সব উপন্যাসে কল্লোলীয় চিন্তা-ভাবনার প্রভাব পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর সাহিত্য রচনায় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব পড়ে। তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহের আঁচ কমে আসে।